সংবাদ

তারিখ 30 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিহার করে একই ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

সামসুল ইসলাম টুকু

১

বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরপর ২ বছর অর্থাৎ ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩টি কলেজকে শিক্ষার মান বিচারে র‍্যাংকিং দিয়েছে। প্রথম– রাজশাহী সরকারি কলেজ, দ্বিতীয়– পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, তৃতীয়– রংপুর কারমাইকেল কলেজ। যেসব মানদণ্ডের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– প্রয়োজনীয় শিক্ষক, জনবল, ক্লাসরুম, শিক্ষা উপকরণ, নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত, পরীক্ষার ফল ইত্যাদি। উল্লেখ করা যেতে পারে, উল্লিখিত ৩টি কলেজ ৬০ বছরের অধিক পুরনো এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতাও ছিল পর্যাপ্ত। অন্য কলেজগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা প্রসারিত হলে অনেক কলেজ র‍্যাংকিংয়ের তালিকায় আসতে পারে। র‍্যাংকিং দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্য সব কলেজগুলো যেন র‍্যাংকিং পাওয়ার জন্য কলেজের শিক্ষার মানোন্নয়নসহ কাঠামোগত উন্নয়ন করার চেষ্টা করে। যদিও তা সরকারি সহযোগিতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কিন্তু একই কলেজকে বারবার র‍্যাংকিং দিলে অন্য কলেজগুলোকে নিরুৎসাহিত ও অবমূল্যায়ন করা হবে। বাকি কলেজগুলোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে তাদের বিদ্যমান শিক্ষা ও কাঠামোগত মান বিচার করে র‍্যাংকিং দিলে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাশাপাশি নিজের মান উন্নয়ন করে প্রথম স্তরের র‍্যাংকিং পাওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল হতে পারে।

আর ভালো ফলটি কলেজ বা কলেজ শিক্ষকদের কৃতিত্ব নয় এবং সরকারের অর্থ সহযোগিতার ফসলও নয়। এ কৃতিত্ব শুধু শিক্ষার্থীদের ও তাদের লেখাপড়ার ফসল। কারণ প্রত্যন্ত এলাকার স্কুল কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের যাচাই-বাছাই করে উল্লেখিত স্কুল কলেজগুলোতে ভর্তি করে নিজেদের ভাড়ার পূর্ণ করে ও ভালো ফল প্রাপ্ত হয়। যদি দায়িত্ব দেয়া হয় ঐ র‍্যাংকিং প্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলোকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে ভালো ফল বয়ে আনার। তাহলে পারবে কি? উত্তর হবে নিশ্চয় না। এ কথাতো শতভাগ সত্য যে, ওই ভালো ছাত্রগুলো কোন না কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত স্কুল কলেজ থেকে পড়েই ভালো ফল করেছে। সুতরাং কথিত ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার একচেটিয়া ব্যবস্থা বন্ধ করা হলে সে ভালো শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার লড়াই করতে হবে না তেমনি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও গরিব ছাত্রদের সেখানে ভর্তি হতে না পারার মনবেদনায় ভুগতে হবে না। আর ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো ছাত্রদের ভর্তি করিয়ে ভালো ফল নিয়ে নাম কুড়ানোর সস্তা বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই অন্ততপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির গোড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুক, ভালো ফল করুক। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম হোক। এরপর অনার্সসহ বিশেষ শিক্ষার জন্য দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক। দেশে ক্যাডেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যেসব অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা কয়েকগুণ বেশি। অন্যদিকে প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমটাই অবহেলিত। এটি যেমন একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তেমনি ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভালো লেখাপড়া হয় এবং ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত, এমন ধারণাও একটি বৈষম্যমূলক ধারণা।

শিক্ষা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। প্রতিটি লেখা পড়ে মনে হয় সম্পূর্ণ সঠিক। শিক্ষা বিষয়টি এত ব্যাপক এবং এত স্তর বিশিষ্ট যে, অল্প কথায় তা লেখা যায় না। শুধু তাই নয় প্রতিটি স্তরে অসংখ্য অনিয়ম ও অসামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়। শিক্ষা বিভাগ যেমন প্রায়ই নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তেমনি নতুন নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। কোনটা শিক্ষার্থীদের পছন্দ নয়, কোনটা অভিভাবকের পছন্দ নয়, কোনটা শিক্ষকদের পছন্দ নয়। যেমন ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ হয়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কলঙ্ক মুছে যায়নি। একটি বিষয়ের একটি পেপারের জন্য ১৫টি লেখকের ১৫টি বইয়ের (এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত) বোঝা, গাইড বই বাণিজ্য, প্রাইভেট কোচিং বাণিজ্যসহ অসংখ্য সমস্যা। বেশ কয়েক বছর আগে যখন সারা দেশে পরীক্ষায় নকলের স্রোত বইছিল তখন একটা লেখায় লেখেছিলাম, শিক্ষার্থীদের টেক্সটবই দেখে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। প্রশ্নপত্রের ধারাটা এমন হবে যেন পরীক্ষার্থীকে টেক্সটবই খুঁজে বের করে লিখতে হয়। এক্ষেত্রে যারা টেক্সটবই ভালো করে পড়বে তারাই ভালো ফল করবে, কিন্তু যারা পড়বে না তারা টেক্সটবই, গাইড বই দেখেও ৫০ নম্বরের উত্তর দিতে পারবে না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন নকল করতে উৎসাহ হারাবে তেমনি বন্ধ হবে গাইড বই ব্যবসা ও প্রাইভেট কোচিং ব্যবসা। প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্যের ব্যাপারে সরকার খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এতে এ বাণিজ্য বন্ধ হবে কিনা জানি না তবে এটাও একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। যাদের অর্থ আছে তাদের ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ৪-৫টা করে প্রাইভেট ও কোচিংয়ে পড়ে। অন্যদিকে গরিবের ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উল্লিখিত সব বৈষম্যমূলক শিক্ষা বন্ধ হওয়া জরুরি।

২

ধীর্ঘকাল ধরে অভিযোগ চলে আসছে যে, শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না, পড়ান না, সময় মতো ক্লাসে আসেন না, দায়সারা ভাবে সিলেবাস শেষ করেন। এ অভিযোগ শুধু শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর বিপরীতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ক্লাস কতটা আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করছে অথবা আদৌ গ্রহণ করছে কিনা এ বিষয়গুলো প্রশ্ন রেখে যায়। বর্তমানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একমুখী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যেমনটা শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করে চলে যান। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তা কতটা গ্রহণ করল অথবা করল না, শিক্ষকদের লেকচার কতটা বোধগম্য হলো এসব বিষয় নিয়ে কোন গভীর পর্যালোচনা বা প্রামাণিক ধারণা অদ্যাবধি সৃষ্টি হয়নি বা যাচাই করার কোন ক্ষেত্র বা পদ্ধতি নেই আর জবাবদিহিতা তো মোটেই নেই। এমনই এক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই শাখার উদ্যোগে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিদ্যমান জনবল, অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কত বেশি আগ্রহী করে তোলা যায় এমন একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন হয় রাজশাহীতে। রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্যান্য পেশাজীবী ছাড়াও ৫টি কলেজের অধ্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। এরা হলেন– রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর রানী ভবানি সরকারি মহিলা কলেজ, ওয়ালিয়া হাকিমুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, বাগাতিপাড়া নাটোর এবং বাউসা কলেজ রাজশাহীর অধ্যক্ষ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই শাখার কর্মকর্তা ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শিক্ষকদের জন্য এমন প্রশিক্ষণ এটাই প্রথম। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত এ পদ্ধতি কিছু কলেজে প্রয়োগ করে কি কি সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হতে পারে। এজন্য একটি ফরম্যাট তৈরি করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে একটি করে ফরম পূরণ করবে। সেখানে শিক্ষার্থীরা মাসে ক'দিন ক্লাস করছে ক'দিন করেনি, কোন শিক্ষক ক'দিন ক্লাস করছে ক'দিন করেনি, তারা সময়ানুবর্তী কিনা, শিক্ষকদের লেকচার বোধগম্য বা আনন্দদায়ক হলো কিনা এ বিষয়গুলো থাকবে। এ পূরণকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যার মূল কারণ এবং এই সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি প্রভৃতি বিষয় চিহ্নিত করা হবে। সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অনাগ্রহ ও শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি। সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদান আকর্ষণীয় নয়, চাহিদা মোতাবেক পাঠদানের অভাব ও অমনোযোগিতা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ও ক্লাসে পাঠদানের মানসিকতার অভাব। এতে সেবা গ্রহীতা হিসেবে শিক্ষক, অভিভাবক ও কলেজকে যেসব ভোগান্তি পেতে হবে তা হলো– খারাপ ফলাফল, কলেজের ইমেজ সংকট, অভিভাবকদের অসন্তুষ্টি ও মানসম্মত শিক্ষাদান ব্যাহত। এ বিষয়গুলোর ফিডব্যাক নিয়ে প্রতি মাসে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। সব উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান এবং শিক্ষকদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে সেগুলো হচ্ছে– প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের বন্ধুর মতো যত্ন সহকারে পাঠদান করা, বই দেখে দেখে পাঠদান না করা, চেয়ার টেবিলে বসে পাঠদান না করা, শিক্ষকদের রুচিশীল পোশাক পরা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা, শিক্ষার্থীদের নাম না জেনে এই ছেলে, এই মেয়ে বলে সম্বোধন না করা, শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার না করা, বোর্ড ব্যবহার না করা, ভুল তথ্য না দেয়া, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা না করা। এমন একটি জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া কার্যকর হলে অবশ্যই ভালো ফল বয়ে আনবে। তবে এই প্রক্রিয়া সব প্রতিষ্ঠানে কবে কার্যকর ও বাস্তবায়ন হবে, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হবে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ দেশবাসী।

[লেখক : সাংবাদিক]